International Journal of Sustainability and Multidisciplinary Research (IJSMR) Vol. 1, No. 1 (2025), Inaugural Issue (January, 2025) *e-ISSN: 3079-0808*

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : নাগরিক নিম্নবিত্ত জীবনের বিচিত্র বীক্ষণ

S.M. Faisal Hossain

Islamic University
Kushtia, Bangladesh
Email: faisal.sajib1989@gmail.com

Submitted Dec, 2024 Published Jan, 2025

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : নাগরিক নিম্নবিত্ত জীবনের বিচিত্র বীক্ষণ

এস.এম ফয়সাল হোসেন

পিএইচ.ডি. গবেষক

বাংলা বিভাগ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

মোবাইল নম্বর : ০১৭৭২-৭৮৭৮৭৪

E-mail: faisal.sajib1989@gmail.com

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : নাগরিক নিম্নবিত্ত জীবনের বিচিত্র বীক্ষণ

Summary

Shailajanand Mukherjee (1901-1976) is a leading figure among the many storytellers who have made a name for themselves in 20th-century Bengali literature with their extraordinary artistic creations. He is the first to bring regionalism to Bengali short stories. He is the one who bypassed idealized reality and gave place to pure reality based on experience in Bengali literature. The diverse picture of the life of the coal mining workers is beautifully depicted in his short stories. Not only the working people, but also the joys and sorrows of the lower-class people of the city of Kolkata, outside the rough red soil, the joys and sorrows, exploitation and deprivation, life and suffering, urban-centered misery and squalor, and the contradictions and contradictions - in short, the multi-colored picture of their lives has been artistically portrayed in his stories with deeper resonance. The article in question reveals the multidimensional nature of the lives of the urban lower class through the analytical and sociological methods of various stories.

Keywords: Citizens of the lower class, Life-suffering, Protest-resistance, Humanity, Economic crisis.

সারসংক্ষেপ

বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে অসামান্য শিল্প সৃষ্টির ক্ষমতা নিয়ে যে কয়জন কথাশিল্পীর দীপ্তপদচারণা ঘটেছিল, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬) তাঁদের মধ্যে পুরোধা ব্যক্তিত্ব। তিনি বাংলা ছোটগল্পে প্রথম আঞ্চলিকতার সংরাগ নিয়ে এসেছেন। তিনিই আদর্শায়িত বাস্তবতাকে পাশ কাটিয়ে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিশুদ্ধ বাস্তবতাকে বাংলা সাহিত্যে স্থান করে দেন। কয়লা খনির শ্রমজীবী মানুষের জীবনের বিচিত্র চিত্র তাঁর ছোট গল্পে শিল্প সৌকর্যে উদ্ভাসিত। শুধু শ্রমজীবী মানুষই নয়, রুক্ষ লাল মাটির বাইরে শহর কলকাতার নাগরিক নিম্নবিত্ত মানুষের আনন্দ-বেদনা, শোষণ-বঞ্চনা, জীবন-যন্ত্রণা, নগরকেন্দ্রিক ক্লেদ-পঙ্কিলতা, বাদ-প্রতিবাদ এককথায় তাদের জীবনের বহুবর্ণিল চিত্রকে শৈলজানন্দ তাঁর গল্পে গভীরতর ব্যঞ্জনায় শিল্পিতরূপ দিয়েছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে বিশ্লেষণাত্মক ও সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতির মাধ্যমে শৈলজানন্দের বিভিন্ন গল্পে নাগরিক নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনের বহুমাত্রিক রূপ উন্মোচন করা হয়েছে।

চাবিশব্দ : নাগরিক নিম্নবিত্ত, জীবন-যন্ত্রণা, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ, মানবতাবোধ, অর্থনৈতিক সংকট।

অর্ধ শতাব্দী আগের কথা। বাংলা সাহিত্যে সে এক বিস্ময়কর দিন। নতুন কিছু সৃষ্টি হতে চলেছে। বাংলা সাহিত্যের আকাশে তখন রবীন্দ্র-নজরুল একই সঙ্গে ভাস্বর হয়ে আছেন। রবীন্দ্রনাথ তখন বাংলা সাহিত্যের মধ্যগগনে, নজরুল তখন বিদ্রোহীর বিস্ফোরণের আলোয় আলোকিত। এরই মঝে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের বিস্ময় জাগিয়ে একেবারে নতুন রকমের স্বাদ আর চমক নিয়ে বাংলা সাহিত্যে নতুন আলোর বিচ্ছুরণ ঘটালেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্র পরবর্তী আঞ্চলিকতার যে অনুবর্তন দেখা যায় বাংলা সাহিত্যে, তার প্রথম স্ফূরণ ঘটে শৈলজানন্দের হাতে। সাহিত্যে, বিশেষ করে গল্পে তাঁর হাত ধরেই রাঢ়বঙ্গের কয়লাখনির কুলি-মজুর, বাউড়ি, বিত্তহীন শ্রমজীবী মানুষের বিচিত্র জীবনকথা প্রকাশ লাভ করেছে। তিনি গল্পে গ্রামীণ সাঁওতাল কুলি-কামিনদের

জীবনকে যেমন বাস্তবতার নিরীখে তুলে ধরেছেন, তেমনি নাগরিক জীবনের ক্লেদ, অবক্ষয়, জীবন-জীবিকা ও দারিদ্র্যের ছবি বিশেষ আন্তরিকতায় উপস্থাপন করে ছোটগল্পে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছেন। তাঁর ছোটগল্পের পরিচয় হচ্ছে বস্তিজীবন, মেসজীবন, নাগরিক জীবন এবং শহরতলীর জীবন। এই জীবনপ্রবাহ কখনো ছবি হয়ে উঠেছে আবার কখনো দ্বান্দ্বিক বাস্তবতার দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে এসেছে মানবতাবোধ, জীবনের স্বপক্ষে বেঁচে থাকার প্রেরণা এবং মানুষের প্রতি অগাধ ভালোবাসা।

বাংলা সাহিত্যে শৈলজানন্দের আবির্ভাব কয়লাকুঠির পটভূমিতে লেখা ছোটগল্প দিয়ে। তাঁর প্রতিভার সর্বোৎকৃষ্ট প্রকাশ ছোটগল্পে। ছোটগল্পের ধ্রুপদী জগতে তাঁর দীপ্তপদচারণা 'আমের মঞ্জরী' (১৯১৪) গল্প দিয়ে। প্রথম দিকে বন্ধু নজরুলকে অনুসরণ করে কবিতা লিখলেও পরবর্তীকালে তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারায় গল্প রচনা করেন। 'বিষয় বৈচিত্র্য এবং বাস্তবচেতনার বহিঃপ্রকাশে তাঁর লেখা অধিকাংশ ছোটগল্পই অনবদ্য হয়ে উঠেছে (সঞ্জীব দাস, ২০১১, পৃ. ৩১)।' তাঁর অসংখ্য গল্প বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। 'প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত গল্পের সংখ্যা প্রায় চার শত (বাঁধন সেনগুপ্ত, ২০১৫, পৃ. ৪৭)।' গল্পগ্রন্থের সংখ্যা ত্রিশ। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য– *মর্ম্মবাণী* (১৯১৯), *অতসী* (১৯২৫), *বধূবরণ* (১৯২৯), *কয়লাকুঠি* (১৯২৯), *সাঁওতালী* (১৯৩১), *পৌষপার্বণ* (১৯৩১), *দিনমজুর* (১৯৩২), *মারণমন্ত্র* (১৯৩২), *নারীজন্ম* (১৯৩৩), *স্বনির্বাচিত গল্প* (১৯৫৫), *মিতোমিতিন* (১৯৫৯), *প্রেমের গল্প* (১৯৬৪), *লোকরহস্য* (১৯৬৯) ইত্যাদি। নানা বিষয়ে গল্প রচনা করলেও শৈলজানন্দ মূলত কয়লাকুঠির লেখক। তিনি নিজেই বলেছেন 'আমার গল্পের সর্বপ্রথম পরিমণ্ডল কয়লাখনি এবং চরিত্রেরা সব কুলিমজুর (অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, ২০১৫, পৃ. ১৮৩)।' কয়লা খনির কুলি-মজুরদের জীবনের বিচিত্র চিত্র অঙ্কনের পাশাপাশি নাগরিক নিম্নবিত্ত মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা, জীবিকা, নৈতিক অবক্ষয়, শাসন-শোষণ, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ, অপত্য স্নেহ বাৎসল্য, মানবতাবোধের আলেখ্য নিয়ে শৈলজানন্দ নির্মাণ করলেন তাঁর ছোটগল্পের বর্ণিল জগৎ। তাছাড়া শৈলজানন্দ দীর্ঘসময় কলকাতায় কাটিয়েছেন। কলকাতা জীবন ছিল দারিদ্র্যপীড়িত। আর্থিক দুরবস্থার কারণে তাকে থাকতে হয়েছে কলকাতার খোলা বস্তিতে, দিতে হয়েছে পানের দোকান। সেই যোগসূত্রে মানব অস্তিত্বের সুতীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণী দৃষ্টি দিয়ে নাগরিক নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন তাঁর সাহিত্যে সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় ধ্বনিত হয়েছে। নজরুল ইসলাম কবিতার মধ্য দিয়ে দারিদ্র্যকে তুলে ধরেছেন আর শৈলজানন্দ ছোটগল্পে ভিন্ন মাত্রায় এর বিস্তার ঘটিয়েছেন, যা বাংলা সাহিত্যে নিঃসন্দেহে নতুন এবং অভিনব। তাঁর সমকালে তাঁর সাহিত্য সম্পর্কিত মন্তব্য এ ক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে :

> ক. শৈলজানন্দের গল্প আমি কিছু কিছু পড়েছি। দেখেছি, দরিদ্র জীবনের যর্থাথ অভিজ্ঞাতা এবং সেই সঙ্গে লেখবার শক্তি তাঁর রচনায় দারিদ্র্য ঘোষণার কৃত্রিমতা নেই। তাঁর বিষয়গুলি সাহিত্যসভার মর্যাদা অতিক্রম করে নকল

দারিদ্র্যের শখের যাত্রাপালায় এসে ঠেকেনি। নবযুগের সাহিত্যে নতুন একটা কাণ্ড করছি জানিয়ে পদভরে ধরণী কম্পমান করবার দাপট আমি তাঁর দেখিনি- দরিদ্র নারায়ণের পূজারীর মস্ত তিলক তাঁর কপালে কাটা নেই। তাঁর কলমে গ্রামের যে সব চিত্র দেখেছি তাতে তিনি সহজে ঠিক কথাটি বলেছেন বলেই ঠিক বলবার কারি পাউডারি ভঙ্গিটি তাঁর মধ্যে দেখা দেয়নি (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩৮৮, পৃ. ২৭৮)।

খ. সানন্দ বিস্ময়ে তাকালাম ভদ্রলোকের দিকে। বাংলা সাহিত্যে ইনিই সেই কয়লাকুঠির আবিষ্কর্তা। নিঃস্ব, রিক্ত, বঞ্চিত জনতার তিনি প্রথম প্রতিনিধি। বাংলা সাহিত্যে তিনি নতুন ভাষা এনেছেন। হাতির দাঁতের মিনার চড়া ছেড়ে যিনি প্রথম নেমে এসেছেন ধূলিম্লান মৃত্তিকার সমতলে (অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ১৪২১, পৃ. ১৬)।

গ. বাংলা সাহিত্যে অপ্রত্যাশিত চমক লাগল শৈলজানন্দের গল্পে। কয়লাকুঠির গন্ধ। সেখানকার সাঁওতাল আদিবাসী কুলি-কামিনদের নিয়ে লেখা। সে গল্পের বিষয় শুধু আলাদা নয় তার পরিবেশ থেকে সুর স্বর সবই ভিন্ন। ... শৈলজানন্দ শুধু নতুন মানুষ নিয়ে নতুন ধরনের গল্প লেখেননি সাহিত্যের ভূগোলই আশ্চর্যভাবে বিস্তৃত করে দিয়েছেন (প্রেমেন্দ্র মিত্র, ২০০১, পৃ. ৭)।

দুই.

নিম্নবিত্ত বলতে আমরা সহজ কথায় বুঝি, বৃত্তি বা পেশায় যারা নিম্নশ্রেণিভুক্ত। নিম্নবিত্ত শব্দকে নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীরা নানা প্রতিশব্দের আশ্রয় নিয়েছেন। এ সকল প্রতিশব্দের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য–অস্পৃশ্য, দলিত, ব্রাত্য, অন্ত্যজ, প্রান্তিক, হরিজন, কৈবর্ত প্রভৃতি। উল্লেখ্য, এরাও পৃথক পরিচয়ে পরিচিত। নিম্নবিত্তরা ভূমি ও সহায়সম্বলহীন। তারা অধিকাংশই দরিদ্রসীমার নিচে বসবাস করে। এরা আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও জাতিগতভাবে যেমন অবহেলিত, বঞ্চিত, তেমনি সক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুগুলো থেকে অনেক দূরে। তাদের জীবনের গতিপ্রকৃতি মন্থর। অধিকার আদায়ে তারা যথেষ্ট সক্রিয় নয়। 'উচ্চবিত্তের সঙ্গে নিম্নবিত্তের সম্পর্ক হলো প্রভুত্ব ও অধীনতার।' (গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ২০১৫, পৃ. ৭) শ্রমিক, মজুর, প্রান্তিক, বর্গাচাষি এবং সম্পত্তির অধিকারী অথচ অন্যের দ্বারা চালিত সকল কৃষক, ডোম, পতিতা, দলিত, দাস, গৃহভৃত্য আদিবাসী, নারী এককথায় নিচু শ্রেণির বা সক্ষমতার নিচে বসবাস করা সকল মানুষ নিম্নবিত্তের অন্তর্ভুক্ত। যারা সব সময় উচ্চবিত্ত দ্বারা শোষিত, লাঞ্ছিত, নিপীড়িত, নির্যাতিত হয়। এরা তাদের ন্যায্য অধিকার মর্যাদা তো পায়ই না বরং উচ্চবিত্ত দ্বারা প্রতি নিয়ত হয় অবহেলিত।

প্রাচীনকাল থেকে সাহিত্যে নিম্নবিত্ত ও এদের সামাজিক অবস্থানের চিত্র উপস্থাপনের রীতি প্রচলিত ছিল। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন *চর্যাগীতিকা* (১৯০৭) তান্ত্রিক ধর্মসাধনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও সেখানে নিম্নবিত্ত সমাজজীবনের চিত্র ব্যাপকভাবে বিধৃত হয়েছে। *চর্যাগীতিকায়* যে সামাজিক পটভূমি পরিলক্ষিত হয়, তার মূল

বৈশিষ্ট্য ছিল নিম্নবিত্ত জীবনের হাহাকার ও নিষ্ঠুর দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত, অবহেলিত মানুষের জীবনের গভীর দীর্ঘশ্বাস। জাতিগত শ্রেণিবৈষম্যের দিক থেকে এরা সকলেই শুধু নিম্নশ্রেণির নয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এদের জীবনমান হীন বা দুর্বল। চর্যায় ডোমরা সাধারণ নাগরিকের ঘৃণার পাত্র। নগরের মধ্যে তাদের বসবাস নিষিদ্ধ ছিল। তারা বসবাস গ্রামের বাইরে, নগরের উপকণ্ঠে উঁচু স্থানে কুঁড়েঘরে। বলা যায় প্রতিবেশহীন পরিবেশে। ১০ নম্বর চর্যায় দেখা যায়:

> নগর বাহিরেঁ ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
> ছোই ছোই জাহ সো ব্রাহ্ম নাড়ি আ।। (নির্মল দাশ, ১৯৯৭, পৃ. ১৩৭)

ডোমদের জাতিগত বৃত্তি ছিল তাঁত বোনা, নৌকা বাওয়া। তাদের জীবনে অভাবের অন্ত ছিল না। কবি তাদের অভাবের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে:

> টালত মোর ঘর নাই পড়সী
> হাড়ীত ভাত নাই নিতি আবেসী। (নির্মল দাশ, ১৯৯৭, পৃ. ১৯০)

সুতরাং বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন *চর্যাগীতিকায়* যে বৃত্তিধারী জাতির পরিচয় পাওয়া যায়, তা মূলত নিম্নবিত্ত জীবনেরই চিত্র।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* (১৯০৯)। এই আখ্যানকাব্যের প্রেক্ষাপটে নিম্নবিত্ত সমাজের দিকটি স্পষ্ট না হলেও সে সময়কার সামাজিক-রাজনৈতিক দিক স্পষ্ট। তবে মধ্যযুগে রচিত অসংখ্য জীবনীকাব্য, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব কবিতা, নাথ সাহিত্যে নিম্নবিত্তের জীবনের চিত্রই অঙ্কিত হয়েছে। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর *মনসামঙ্গল* কাব্য দিয়ে যাত্রা শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভরতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে এসে মঙ্গলকাব্যের সমাপ্তি ঘটে। মঙ্গলকাব্যের প্রধান তিনটি ধারা–মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল। এ ছাড়া শিবমঙ্গল, কালিকামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব কাব্যে দেবতা ও মানুষের অলৌকিক ক্রিয়াকল্প ছাড়া নিম্নবিত্ত জীবনের বাস্তব ছবিও চিত্রিত হয়েছে পরম মমতায়।

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলোতে উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তের চিত্র ফুটে উঠেছে প্রত্যক্ষরূপে। *মনসামঙ্গল*'র বিস্তৃত পটভূমিতে আছে সরাসরি পরস্পরবিরোধী দুটি শ্রেণি– একটি উচ্চবিত্ত, অন্যটি নিম্নবিত্ত। প্রথমটি সমাজের উচ্চ কোটির মানুষ এবং তার সঙ্গে আছে ব্রাহ্মণ্য লোকাচার। চাঁদ সওদাগর এ শ্রেণির প্রতিনিধি। দ্বিতীয় পক্ষে মনসা নিজেই বঞ্চিত, নিরাশ্রয়, সর্বহারা শ্রেণির প্রতিনিধি। কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যের *কালকেতু উপাখ্যান* সাধারণ নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষের জীবন্ত দলিল (মাম্পি বৈদ্য, ২০১৮, পৃ. ৪২)।' বলা যায়, এ কাব্যটি

নায়ক কালকেতু ও নায়িকা ফুল্লরার দুঃখময় জীবনের বৃত্তে আছে। কালকেতু-ফুল্লরার দাম্পত্য জীবনের মধ্য দিয়ে অন্ত্যজ শ্রেণির জীবনচর্চা ফুটে উঠেছে। কালকেতুরা তিনটি প্রাথমিক চাহিদা– খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান মেটাতে অসমর্থ ছিল। পেশা অনুযায়ী দরিদ্র থেকে বেঁচে ওঠা সম্ভব তাদের ছিল না। এ কথা আমরা কালকেতুর কাছ থেকে জানতে পারি:

> ভাঙা কুড়্যা ঘরখানি পত্রের ছওনী।।
> ভেরেণ্ডার থাম তার আছে মধ্য ঘরে।
> প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙে ঝড়ে। (মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, ২০০৫, পৃ. ১৭১)

ধর্মমঙ্গল কাব্যের ধর্মঠাকুর নিম্নশ্রেণির মানুষের দেবতা। আবার *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের দেবী অন্নদা ছিলেন তৎকালীন সমাজের নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনদেবতা। সে সময় সমাজের নিম্নবিত্ত মানুষের দুর্বল আর্থ-সামাজিক কাঠামো এ কাব্যে উঠে এসেছে, যা হর-পার্বতীর দারিদ্র্যপীড়িত সাধারণ মানুষের সংসার দেখে বোঝা যায়। ভারতচন্দ্র তাঁর *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের *মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান*-এ ঈশ্বরী পাটনীর যে চরিত্র এঁকেছেন, তা নিম্নবিত্ত শ্রেণিরই পরিচায়ক। এ থেকে বলা যায়, মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলোর মধ্যে যে সমাজজীবন বিধৃত, তা নিম্নবিত্ত মানুষেরই জীবনকথা। এ ছাড়া চৈতন্যজীবনী গ্রন্থ, মৈয়মনসিংহ গীতিকায় নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনালেখ্য রূপায়িত হয়েছে।

আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যের নাটক ও উপন্যাসে নিম্নবিত্ত প্রসঙ্গ ব্যাপক পরিসরে এলেও ছোটগল্পে এসেছে ভিন্ন মাত্রায়। বাংলা ছোটগল্পের সূচনালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক গল্পকারের গল্পে নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনকথা কমবেশি স্থান পেয়েছে। বাংলা ছোটগল্পের সার্থক স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে একালের আবুল বাশার (১৯৫১), অমর মিত্র (১৯৫১), অনিল ঘড়াই (১৯৫৭) পর্যন্ত সমস্ত গল্পকার তাঁদের কোনো না কোনো গল্পের বিষয় হিসেবে নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনকে গ্রহণ করেছেন। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের গল্পে সমাজের প্রান্তিক শ্রেণির বৈচিত্র্যময় জীবনোচ্ছ্বাস পরম মমতায় চিত্রিত হয়েছে। কারণ হিসেবে বলা যায়, এই সব নিম্নশ্রেণির জীবনের অসহায়ত্ব, গ্লানি, কঠোর সংগ্রাম ও শোষণের সমান্তরালে তাদের চেতন, অবচেতন মনের জৈবিক চাহিদা, উদরপূর্তি, অবদমিত কামনা-বাসনা– 'সবকিছুর সম্মিলনে গোটা মানুষের অনুসন্ধানে তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ, তপস্যাব্রতী সাধক (গোপিকানাথ রায় চৌধুরী, ২০১৪, পৃ. ২৯৩)।'

তিন.

প্রতিটি সমাজের মানুষের জীবনচর্চার পরিপূর্ণ রূপ-রূপায়ণে আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিচার-বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে সমগ্র জাতি-সম্প্রদায়ের পরিচয় পাওয়া যায়। তাই বিশেষ সমাজগোষ্ঠীর চালচিত্রাঙ্কনে আর্থ-সামাজিক অবস্থার আলোচনা সবিশেষ গুরুত্বের দাবি

রাখে। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় সেই বিশেষ সমাজগোষ্ঠী অর্থাৎ নিম্নবিত্ত জীবনাশ্রিত ছোটগল্পগুলোতে নিম্নবিত্তের জীবনচিত্র অঙ্কনে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। শৈলজানন্দের এ ধরনের গল্পগুলোর বিশ্লেষণে দেখি নিম্নবিত্তের মানুষের আর্থিক অবস্থা সংকটাপূর্ণ। বলা যায়, দারিদ্র্যের মধ্যে এদের জন্ম, দারিদ্র্যের সঙ্গেই এদের বসবাস। নিম্নবিত্তের মানুষ এই দারিদ্র্যের হাত থেকে বাঁচার জন্য বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হয়ে কঠোর পরিশ্রম করে। নিম্নবিত্তের মানুষের সামাজিক অবস্থা বিচারে বলা যায়, তারা চিরকাল অত্যাচারিত, নিপীড়িত এবং অধিকারবঞ্চিত। তবে এসব নিম্নবিত্ত মানুষের মধ্যে কখনও কখনও শোষকের বিরুদ্ধে, অধিকার আদায়ে, সম্ভ্রম রক্ষার্থে প্রতিবাদী হয়েছে, হয়েছে আত্মসচেতন। শৈলজানন্দের গল্পে এ সকল মানুষ শোষকশ্রেণি দ্বারা শোষিত হলেও তাদের মধ্যে মানবিকতা, অপত্যস্নেহ-বাৎসল্য প্রভৃতি সুকুমার প্রবৃত্তিগুলো নিঃশেষিত হয়নি। এই সুকুমার প্রবৃত্তিগুলো উপস্থাপনে শৈলজানন্দ মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন।

শৈলজানন্দ তাঁর নাগরিক জীবনকেন্দ্রিক গল্পে নিম্নবিত্ত মানুষের দারিদ্র্যপীড়িত জীবনকে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তুলে ধরেছেন। এ সকল নিম্নবিত্তের মানুষ এতটাই হতদরিদ্র যে ঠিকমতো আহারাদি গ্রহণ করতে পারে না। তাদের জীবনে কখনও ভালোমন্দ অন্ন-ব্যঞ্জন সহকারে রসনা তৃপ্তিদায়ক খাদ্য গ্রহণের সুযোগ আসে না। খাদ্যতালিকায় আমিষের স্থান নেই বললেই চলে। অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকে ডাস্টবিনে পড়ে থাকা উচ্ছিষ্ট খেয়ে থাকতে হয়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'হাড়' গল্পেও নিরন্ন মানুষদের ডাস্টবিনের উচ্ছিষ্ট খাবার খেতে দেখা যায়। গল্পে এই হাড় রায় বাহাদুরের যাদুর বাহন হলেও হাড় বুভুক্ষু মানুষের আর্তনাদ ও জীবনচেতনার প্রতীক, অসহায় নিরন্ন মানুষের বেঁচে থাকার অবলম্বন।

> সামনে ডাস্টবিন। পাশের অবগুণ্ঠিত ল্যাম্পপোস্ট থেকে একটা ছোট আলোকচক্র পড়েছে তার ওপর। তিন চার জন অমানুষিক মানুষ তার ভেতর হাত ডুবিয়ে খুঁজছে খাদ্য। একটু দূরেই একটা কঙ্কালসার কুকুরের ছায়ামূর্তি-নতুন প্রতিযোগীদের কাছে ভিড়বার ভরসা পাচ্ছে না। কাঠির মতো হাত-পা আর বেলুনের মতো পেটওয়ালা একটা ছোট ছেলে দু'হাতে কি চুষছে প্রাণপণে। হাড়? হাঁ, হাড়ই তো (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৪১৯, পৃ. ৩৭)

কিন্তু আমরা দেখি, শৈলজানন্দ তাঁর 'ধ্বংসপথের যাত্রী এরা' গল্পটি মন্বন্তরের ব্যঞ্জনায় উপস্থাপন করেননি বরং তিনি এ গল্পে নগর কলকাতার রূঢ় বাস্তব চিত্রই অঙ্কন করেছেন। বস্তির মেয়ে অতসীর ক্ষুধার জ্বালা নিবারণে আমরা সেই চিত্রই দেখি। গল্পে বস্তির মেয়ে অতসী ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে নর্দমার পাশে ফেলে যাওয়া ভাতের ফেন খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেছে। অতসীর কথায়:

> এই নর্দমা থেকে এই মালসার আধ মালসা ফেন ধরে নিয়ে গেছি। এই দেখ বাবু, এই এতটুকুন–'.... অজিত জিজ্ঞাসা করিল, ' ফেন্ কি করেছিস্?' 'খেয়েছি বাবু, আমি অর্ধেকটা, মা অর্ধেকটা। দাও না বাবু ওকে বলে–এঁটো ভাত চারটি দিক এতে। আমরা কাল থেকে কিছু খাইনি (শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, ১৪২৩, পৃ. ১০)।

পৃথিবীর ইতিহাসের মতো ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের ইতিহাসও প্রাচীন। আমাদের চারপাশে দরিদ্র মানুষের ভিড়, তাদের হাহাকারে বাতাস ভারী। লোভ এবং ক্ষুধা–এই প্রবল চাপের শিকার নাগরিক নিম্নবিত্ত মানুষ। শৈলজানন্দের 'ধ্বংসপথের যাত্রী এরা' গল্পে সে ছবি গভীরতর ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত । শহরের ভিক্ষুকগুলো ক্ষুধার যন্ত্রণায় একটুকরো খাবারের আশায় জড়ো হয়েছে পার্কের ভিতরে– কোনো এক বড়লোক কাঙালিভোজ দেবে এ সংবাদ শুনে। একমুঠো খাবারের আশায় জড়ো হওয়া ভিক্ষুকগুলোর হাহাকারের ছবি শৈলজানন্দ এঁকেছেন এভাবে:

> কত রকমের, কত ভিক্ষুক,– বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, বালক, শিশু– কেউ কানা, কেউ খোঁড়া, ব্যাধিগ্রস্ত, অথর্ব, নিঃসহায়, নিরাশ্রয়, দারিদ্র্যনিপীড়িত, ক্ষুধায় আর্ত– আহারের জন্য উদগ্রীব হইয়া সকলেই হাঁ হাঁ করিতেছে (শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, ১৪২৩, পৃ. ৮)।

বিশ্বযুদ্ধোত্তর কলকাতার অর্থনৈতিক টানাপোড়েন ও অর্থহীন নিম্নবিত্ত মানুষের চরম দুর্দশার গল্প 'জননী'। গল্পে রোহিণীবাবু শহরের একটি অফিসে নিম্নপদস্থ কর্মচারী। স্ত্রী ও চার কন্যা নিয়ে তার সংসার। অনেক কষ্ট করে রোহিণীবাবু তার সংসার চালায়। আর্থিক সচ্ছলতা না থাকায় পরিবারে বস্ত্রসংকটের সৃষ্টি হয়। তাছাড়া কালোবাজারী, চোরাকারবারীরা বাজারে সুতা ও বস্ত্রের কৃত্রিম সংকট তৈরি করে চালাচ্ছে দুঃশাসনের রাজত্ব। এই দুঃশাসনের রাজত্ব আমাদের মানিকের 'দুঃশাসনীয়' গল্পের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। গল্পে আনোয়ারের স্ত্রী রাবেয়া ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করলেও লজ্জা নিবারণের যন্ত্রণা সহ্য করতে পারে না। তাই সে স্বামীকে বলে 'আজ শেষ, আজ যদি না কাপড় আনবে তো তোমায় আমার খতম, পুকুরে ডুবব খোদার কসম (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০৮, পৃ. ৯৩)।' শত চেষ্টা করেও আনোয়ার স্ত্রীর কাপড় জোগাড় করতে পারেনি। ফলে রাবেয়া জলে ডুবে আত্মহত্যা করে। অন্য দিকে শৈলজানন্দের 'জননী' গল্পে রোহিণীবাবু তার মেয়ের পোশাক জোগাড় করতে পারেনি। তাই পোশাকের অভাবে রোহিণীবাবুর মেয়ে টেবি বাইরে বের হতে পারে না। নিরুপায় হয়ে সে তার মায়ের পুরানো শাড়ি পরে লজ্জা নিবারণ করে। লেখক সেই নিদারুণ বস্ত্রসংকটের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে:

> মা বলে, 'আমার যে শাড়িটা দিয়েছি সেটা কি হল?' সেইটেই পরেছিল জয়ী। বললে, 'পুরনো কাপড়– এ আর কতক্ষণ টিকবে? এই দ্যাখো'– বলে সে কাপড়ের আঁচলটা মায়ের সামনে মেলে ধরলে।– 'বসতে গেলাম তো এই একখানা পচ করে ছিঁড়ে গেল (শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, ১৪২৩, পৃ. ৩৬১)।

'বোকা নরহরি' গল্পে নিম্নবিত্তের মানুষ নরহরির বস্ত্রহীনতার কারণে দুর্দশাভোগের মর্মান্তিক চিত্রও গল্পকারের দৃষ্টি এড়ায়নি। নরহরির বড় সংসার। সাত-সাতটা পেটে দু-বেলা দু-মুঠো পাত পাড়তেই সে হিমশিম খায়। মেয়েদের যে একটা কাপড় কিনে দিবে, সে সামর্থ্য তার নেই। অথচ বাজারে কাপড়ের অভাব নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে শহরের বড় বড় ব্যবসায়ী মুনাফার লোভে বস্ত্রের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। যার কারণে নরহরি

তার সামর্থ্য অনুযায়ী বড় মেয়ের জন্য কাপড় কিনতে পারিনি। নরেন্দ্রমিত্রের 'আবরণ' গল্পে বস্ত্রসংকটের কারণে চাঁপাও সম্পূর্ণ আবরণহীন হয়ে ঘরের ঝাঁপ বন্ধ করে থাকতে বাধ্য হয়েছে। পরনের শতচ্ছিন্ন কাপড়টি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। নরহরির মেয়ের ঠিক একই অবস্থা। পিতা হয়ে সন্তানের লজ্জা নিবারণ করতে না পারা ব্যর্থ পিতার হাহাকারের কথা লেখকের বর্ণনায় উঠে এসেছে এভাবে:

> চড় চড় করে জিনিসপত্তের দাম বাড়ছে আর আমার জিব বেরিয়ে যাচ্ছে এতগুলি পেট ভরাবার জন্যে। বড় মেয়েটার বয়েস হল গিয়ে আঠারো-উনিশ বছর। শাড়িটা তার এমন ছিঁড়েছে যে লজ্জায় কারো সামনে বেরোবার জো নেই (শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, ১৪২৩, পৃ. ৩৩৯)।

বৃত্তিজীবী মানুষের অর্থনৈতিক সংকটে শৈলজানন্দ ব্যথিত। নিম্নবিত্তের মানুষের চরম ব্যর্থতা, দারিদ্র্যের চাপে অন্তর্নিহিত নৈতিক আদর্শবোধ এবং সনাতন জীবনপ্রত্যয় কীভাবে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়, শৈলজানন্দ গল্পে তা অননুকরণীয় ভাষায় শিল্পরূপ লাভ করেছে। তাই প্রবল অর্থসংকট থেকে মুক্তি পেতে 'জননী' গল্পে রোহিণীবাবু অবৈধ পথে অর্থ উপার্জন করেছে। যেমনটি প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পুন্নাম' গল্পে ললিত চরিত্রে দেখা যায়। গল্পে বিবেক বা নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়ে ললিত জাহাজের মালামাল চুরি করে বিক্রি করে। স্বল্প বেতনভোগী ললিতের চুরি করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না; কেননা– 'মাসে যা আয় হয় তাতে মুদির ঋণ শোধই চলে না (প্রেমেন্দ্র মিত্র, ১৯৫২, পৃ. ১৫)।' প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে ললিত হয়তো চুরি করেছে। আবার চুরির মালামাল বিক্রি করে যথাযথ মূল্য পেয়েছে। কিন্তু শৈলজানন্দের 'জননী' গল্পের রোহিণীবাবুর ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। জীবন নির্বাহের জন্য সে অফিসের খাতা-কলম চুরি করে নিয়ে এসে কম দামে সেগুলো সুরেনের কাছে বিক্রি করে। কিন্তু ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস সেখানেও চলে উঁচুতলার মানুষের নির্মম ও ঘৃণ্য শোষণ-পীড়ন। বিক্রিত পণ্যের টাকাও পুরোপুরি পায় না। সে জন্য রোহিণী বলে: 'টাকাটা কোঁচড়ে রেখে রোহিণী বাবু বললে, 'শালা! মুখেই বড়লোক! অফিস থেকে কাগজ-পেন্সিল চুরি করে আনার কষ্টটি তো বোঝো না বাবা!' এই টাকাগুলো যদি ঠিক ঠিক পাওয়া যেত তো জয়ী পরুক না কাপড় (শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, ১৪২৩, পৃ. ৩৬২)!

নাগরিক নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন দারিদ্র্যপীড়িত লাঞ্ছিত জীবন। অর্থকষ্ট ও অন্নকষ্টের জালে জড়িয়ে পড়া নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনের রূপায়ণ ঘটেছে 'বোকা নরহরি' গল্পে। অন্নকষ্টের ফলে দারিদ্র্যলাঞ্ছিত মানুষ খেটে মরে, কখনও একটু খাবারের জন্য উচ্চবিত্ত মানুষের কাছে পায় লাঞ্ছনা, অবহেলা, অবজ্ঞা। গল্পে নরহরি হতদরিদ্র মানুষ। তার সন্তানদেরকে ঠিকমতো খাবার সে দিতে পারে না। তাই আশেপাশে কোনো বাড়িতে অনুষ্ঠান হলে বিনা নিমন্ত্রণে চলে যায় একটু খাবারের আশায়। এ জন্য তাকে আঘাতের বেদনা, অনেক অপমানের জ্বালা সহ্য করতে হয়েছে। সেই মর্মস্পর্শী যন্ত্রণার চিত্র:

> জায়গা খালি পড়ে রয়েছে তবু তাকে কেউ বসতে দিচ্ছে না। বিষণ্নমুখে লোকটি দাঁড়িয়ে আছে সাত-আট বছরের একটি মেয়ের হাত ধর ... জিজ্ঞাসা করিলাম,'কি হয়েছে?' কলাপাতার ওপর লুচি দিচ্ছিলেন যিনি– তিনি বললেন,

'উনি বরযাত্রীও নন, কনে যাত্রীও নন। বিয়েবাড়ি দেখে মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে চলে এসেছেন খেতে।– চলে যান না মশাই (শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, ১৪২৩, পৃ. ৩৩৬)।

নাগরিক নিম্নবিত্ত মানুষের অর্থনৈতিক দুর্দশার চিত্র ফুটে উঠেছে 'রাখাল মাস্টার' গল্পে। গল্পে অর্থের অভাব স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে থাবা বসিয়েছে– থাবা বসিয়েছে তাদের প্রেমের মধ্যে। দুজনের সংসার হলেও দুঃখ, দুর্ভোগ, অভাবের শেষ নেই। কলহ তাদের নিত্যসঙ্গী। নিত্য সাংসারিক দ্বন্দ্ব, কলহ সর্বোপরি স্ত্রীর ভালোবাসাহীনতা সব কিছুর মূলে চরম দরিদ্রতা। এমনকি অর্থের অভাবে রাখাল মাস্টার তার স্ত্রীর পছন্দের খরগোশের মাংস খাওয়াতে পারেনি। গল্পে দেখা যায়, মুংরা নামে এক যুবক খরগোশ নিয়ে এলে রাখাল মাস্টার তাকে ফিরিয়ে দেয়। অগত্যা গল্পের কথক আট পয়সা দিয়ে অর্ধেক মাংস কিনে দেয়। রাখালের স্ত্রী এতে খুশি হয়। সেইবার কথক প্রথমবারের মতো রাখালের স্ত্রীকে দেখে। রাখালের স্ত্রীকে দেখে কথক তাদের আর্থিক অবস্থা উপলব্ধি করেছেন এভাবে:

দেখিলাম– আয়ত দুটি চক্ষু, ম্লান একটুখানি হাসি। গৌরবর্ণ কৃশাঙ্গী যুবতী, – দেখিলে সুন্দরী বলিয়া ভ্রম হয়। তবে সৌন্দর্য তাহার একদিন ছিল তাহাতে আর কোনো সন্দেহ রহিল না। দুঃখ দারিদ্র্যে সে সৌন্দর্য আজ তাহার ম্লান হইয়া গেছে (শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, ১৪২৩, পৃ. ১০০)।

অভাব-দারিদ্র্য কীভাবে অভিশাপ হয়ে নিম্নবিত্তের মানুষকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেয়, তারই ভয়ঙ্কর নির্মম বাস্তবতার ছবি শৈলজানন্দ এঁকেছেন 'শশী পণ্ডিতের সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী' গল্পে। মফস্বল শহরের হতদরিদ্র ব্রাহ্মণ শশীশেখর মাইনর স্কুলের থার্ড পণ্ডিত। তার একমাত্র ছেলেটা বর্ধমানের হাসপাতালে ভর্তি। ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে মাথা ফাটিয়েছে। আবার ঘরে মরণাপন্ন স্ত্রী। অর্থের অভাবে চিকিৎসা করানোর ক্ষমতা তার নেই। স্ত্রী-সন্তান দুজনেই বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়া শশীশেখর স্কুলে ঠিকমতো পড়াতে না পারার কারণে অনেকেই তাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে। স্ত্রী-সন্তানের মৃত্যু ও মানুষের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কারণে এক অসহ্য মানসিক যন্ত্রণায় শশীশেখর অন্যত্র চলে যায়। এদিকে দীর্ঘদিন ধরে শশীর কাশি হওয়ায় যক্ষ্মায় রূপ নেয়। কাশির সঙ্গে তার রক্ত ওঠে। কিন্তু চিকিৎসা করানোর অর্থ তার নেই। তাই অর্থের অভাবে চিকিৎসা করতে না পারায় সে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। যেমনটি প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সংক্রান্তি' গল্পের নায়কের জীবনে ঘটেছিল। আর্থিক সংকটের কারণে সে মেসের ভাড়া, পাওনাদারদের ঋণ পরিশোধে অক্ষম। এরপর বন্ধুর নিকট অর্থ প্রার্থনার ঘটনায় চরমভাবে অপমানিত হয়ে আত্মহত্যায় উদ্বুদ্ধ হয়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের নায়ক হয়তো এক সময় আর্থিক সংকট কাটিয়ে উঠতে পারতো কিন্তু শৈলজানন্দের শশী মাস্টারের ক্ষেত্রে তা সম্ভব ছিল না। কেননা অর্থের অভাবে সে যেমন অসুস্থ স্ত্রী-সন্তানের চিকিৎসা করাতে পারেনি, তেমনি পারেনি নিজের চিকিৎসা করাতে। অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে শশীশেখর শেষপর্যন্ত মৃত্যুকে বেছে নেয়। হৃদয়বিদারক এই মৃত্যুর বর্ণনা গল্পকারের ভাষায় ফুটে উঠেছে এভাবে:

> মর্গে তাহার মৃতদেহটাকে কাটিয়া ছাঁটিয়া তন্ন তন্ন করিয়া তাহারই উপর কত রকমের পরীক্ষা চলিতে লাগিল! ডাক্তারে ছাড়-পত্র লিখিয়া দিল। অবশেষে দিন দুই পরে, তাহার সেই বিকৃত পচা দেহটাকে মুচি-মুর্দাফরাসে দড়ি বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া কোথায় কোন গোভাগাড়ে ফেলিয়া দিয়া আসিল। সেই দিন হিম-শীতল বিস্রব্ধ রজনীর নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে শৃগাল–শকুনিগুলো শশীপণ্ডিতকে লইয়া খাওয়া খাওয়ি করিতে করিতে তাহাদের শ্মশান–উৎসবমাতাইয়া তুলিল (শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, ১৪২৪, পৃ. ১১৫)।

চার.

নাগরিক নিম্নবিত্তের মানুষ সর্বদা লড়াই করে বেঁচে থাকে। এই লড়াইয়ের মাধ্যম হিসেবে তারা বিভিন্ন কর্মকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করে। শৈলজানন্দের 'ধ্বংসপথের যাত্রী এরা' গল্পে আমরা দেখি বস্তির মেয়ে অতসী ময়লা-আবর্জনা থেকে কয়লা কুড়িয়ে সেগুলো বিক্রি করে প্রত্যহ তিন পয়সা রোজগার করে। আবার দু-বেলা দু-মুটো খেয়ে বেঁচে থাকার তাগিদে অতসীর মা ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করেছে। তবে এই ভিক্ষাবৃত্তি তার ইচ্ছাকৃত নয়, অভাবের তাড়নায় সে ভিক্ষা করেছে। জগদীশ গুপ্তের 'চার পয়সার এক আনা' গল্পেও মানুষ প্রচণ্ড আর্থিক অনটনে পড়ে, বিপর্যস্ত জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করতে শুরু করেছে। দুই ভাই শশী ও কাশী নিতান্ত কায়ক্লেশে নিজেদের সংসার চালায়। শশী খোঁড়া ও শারীরিক দিক থেকে অক্ষম। সে ভিক্ষা করে সংসার চালায়:

> বলিতে কি খঞ্জ দূরবর্তী পল্লী অঞ্চলে যাইয়া দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষাই করে। ভিক্ষার চাল আড়াতে বিক্রয় করিয়া ঘরে আনে পয়সা। কাশী ছাড়া আর কেহ তা জানে না (জগদীশ গুপ্ত, ১৩৬৫, পৃ. ৩৩৮)।

ভিক্ষার কাজে শশীর মনে কিছুটা অসম্মতি থাকলেও অক্ষম জীবনে এ ছাড়া তার অন্য কোনো উপায় ছিল না। শৈলজানন্দের 'ধ্বংসপথের যাত্রী এরা' গল্পে অজিত অতসীর মাকে ভবানীপুরে একটি পাত্র হাতে নিয়ে ভিক্ষা করতে দেখে। 'অতসী মা এতক্ষণ হেঁট মুখে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার ভিক্ষা পাত্রের উপর টাকা দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল। অভাবের তাড়নায় মিথ্যার মুখোশ পরিয়া দ্বারে দ্বারে প্রবঞ্চনা করিয়া বেড়ায় (মুখোপাধ্যায়, ১৪২৪ : ১৫)।' মূলত ভিক্ষাবৃত্তি করতে না চাইলেও বেঁচে থাকার জন্য অতসীর মাকে এ কাজে নামতে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক অচ্যুৎ গোস্বামী মন্তব্য করেছেন:

> বাংলা কাহিনীর নায়ক দান করবে এর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। কিন্তু ভিখারিনীর চোখের গভির কৃতজ্ঞতার চাহনিটুকু যে লেখকের দৃষ্টি এড়ায়নি এতেই লেখকের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে (অচ্যুৎ গোস্বামী, ২০১৩, পৃ. ২০৮)।

নাগরিক নিম্নবিত্ত মানুষের একটি অন্যতম প্রধান জীবিকা হলো পকেটমারা, ছিনতাই করা। জীবন-জীবিকার প্রশ্নে নিম্নবিত্তের মানুষগুলো কোনো কোনো ক্ষেত্রে ন্যায়-অন্যায়বোধকে উপেক্ষা করে এই পথে নামে। যদিও তারা

চুরি, ছিনতাই করেছে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে নিজেদের সংসারকে বাঁচানোর জন্যই। শৈলজানন্দের 'বৃদ্ধ' গল্পে বনমালীর জীবিকার মূল অবলম্বন পকেটমারা। বনমালী প্রথম দিকে অন্যের পকেট মেরে জীবিকা নির্বাহ করত। বনমালীর স্বীকারোক্তিতে তার প্রমাণ মেলে:

> ছেলেবেলা বাপ মা মরা গেল– বোম্বেটে হয়ে পড়লাম। কলকাতায় জাল, জুয়োচুরির তো অভাব নাই, বাবু! তাই পকেট কাটাদের দলে ঢুকলাম। লোকের পকেট কেটে বেশ রোজগার হত। বাবুর মতো বেড়াতাম; লোকে দেখলে সন্দেহ করতে পারত না (শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, ১৪২১, পৃ. ২৬৪)।

নগর কলকাতা শহরে নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন সংগ্রামের জীবন। দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয় প্রতিনিয়ত। বেঁচে থাকার জন্য কখনও কখনও প্রতারণার আশ্রয়ও নেয় নগরের অসহায় মানুষরা– তারই ছবি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শৈলজানন্দ তুলে এনেছেন 'মর্যাদা' গল্পে। উড়িয়া বামুন কলকাতা কর্পোরেশনের জলের কুলি। ভোররাত্রে হোসপাইপ দিয়ে রাস্তায় জল দেয়। আর দুপুর হলে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পাশে ভাগ্য গণনার কাজ করে। আবার এই উড়িয়া বাজার থেকে শিল কিনে লাল রঙের কাপড় জড়িয়ে তেল সিঁদুর দিয়ে কালীঘট মন্দিরের পাশে রেখে দেয়, কিছু অর্থ উপার্জনের জন্য। লেখক তার এই মিথ্যা প্রতারণা করার ছবি এঁকেছেন এভাবে:

> ফুলের মালায় আর বেলপাতায় শনিঠাকুরের সর্বাঙ্গ ঢাকা দিয়ে সে এক বিচিত্র সজ্জায় ঠাকুরকেও সাজায়, নিজেও সাজে। কপালে মস্ত বড় সিঁদুরের ফোঁটা নেয়, ঘষা চন্দন দিয়ে নিজের বুকে হাতে মুখে তিলক কাটে, লাল রঙের পাটের ধুতির পরে সিল্কের উড়নি গায়ে দেয় (শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, ১৪২৪, পৃ. ২২৭)।

'নোংরা বস্তি' কলকাতার বস্তিজীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে। লেখকের প্রথম যৌবনে বস্তিতে থাকার অভিজ্ঞতালব্ধ সেই চোখে দেখা জীবন এ গল্পে স্থান পেয়েছে। গল্পটিতে নানা চরিত্রের ভিড়। সকলেই দারিদ্র্যপীড়িত অর্থকষ্টের জালে জড়িত। নারী পুরুষ সকলে বিভিন্ন পেশায় যুক্ত। কেউ চা বিক্রেতা, কেউ ট্যাক্সিচালক, কেউ ফেরিওয়ালা আবার কেউ কলকারখানার গাড়ি ধোয়ার কাজ করে অতিকষ্টে জীবিকা নির্বাহ করে। এসব নিম্নশ্রেণির জীবিকার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে:

> গাঁদার বড় ছেলেটা মোটর কারখানায় গাড়ি ধোয়ার কাজ করে, মেজটা যায় বিড়ির কারখানায়। ... রাম-রসিকের চালায় চুল্লিতে কড়াই চাপে, তেলের জিলিপি তৈরি করিয়া কোথায় কোন দোকানে বিক্রি করিয়া আসে। ... হরমান ... নাগরাই পায়ে দিয়া শহরের একটা বড় রাস্তার ধারে– গাড়ির আড্ডার পাশে গিয়া বসে; বস্তির গুজব নাকি সে চা বিক্রি করিয়া দু-দশ রোপিয়া রোজ কামায় (শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, ১৪২৩, পৃ. ৩৭)।

নিম্নবিত্তের নারীকে ঝিগিরি করে জীবিকা নির্বাহ করতে দেখা যায় 'মর্যাদা' গল্পে। গল্পে মোহিনী বিধবা হলে শ্বশুরবাড়িতে তার স্থান হয় না। আবার কলকাতায় দাদার সংসারে মেলে না একটু আশ্রয়। যদিও আশ্রয় শেষ পর্যন্ত

মেলে, কিন্তু বৌদির কটু কথায় জীবন হয়ে ওঠে অতিষ্ঠ। তাই বেঁচে থাকার তাগিদে মোহিনী জীবিকার উপায় হিসেবে ঝিগিরি বেছে নেয়। সে পাড়ায় একটা বাড়িতে ঝিগিরি করে দশ টাকা বেতন পায়। যা দিয়ে মোহিনীর জীবিকা নির্বাহ হয়। লেখকের বর্ণনায়: 'এ-বাড়ি সে-বাড়ি ঘুরতে ঘুরতে পাড়ারই একটা বাড়িতে তার চাকরি জুটে গেল। সেইখানেই থাকবে, খাবে, মাসে দশ টাকা মাইনে পাবে। আর পাবে বছরে দু-জোড়া কাপড়, শীতের সময় একখানি শীতবস্ত্র (শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, ১৪২৩, পৃ. ২২৫)।'

পাঁচ.

শহরের নিম্নবিত্ত মানুষের সমাজে মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার অধিকার তাদের নেই। সে অধিকার কেড়ে নিয়েছে সমাজের উচ্চবিত্ত মানুষেরা। তাই অসহায়, দরিদ্র-নিম্নবিত্ত মানুষের সামাজিক ইতিহাস শুধু বঞ্চনা-লাঞ্ছনা আর অপমানের। উচ্চবিত্ত ও উচ্চবর্ণের মানুষের সুকৌশলী ও সুবিধাবাদী সামাজিক স্তর বিন্যাসের চাপে নিম্নবিত্তের মানুষ চিরকাল ধরেই বঞ্চিত-লাঞ্ছিত হয়ে আসছে। শৈলজানন্দ সেই বঞ্চনার ছবি তুলে এনেছেন 'ধ্বংসপথের যাত্রী এরা' গল্পে। গল্পে নিম্নবিত্ত মানুষজন সামান্য খাবার জল নিতে পারে না উচ্চবিত্তের কারণে। এর পিছনে সূক্ষ্ম যে বিষয় ক্রিয়াশীল ছিল, তা হলো নিম্নশ্রেণির মানুষ জল নিলে উচ্চ শ্রেণির জাত চলে যাবে। তাই গল্পে দেখা যায়, বস্তির মেয়েরা জল নিতে আসলে পঞ্চানন তাদের তাড়িয়ে দেয়।

> পঞ্চানন আর অপেক্ষা করিতে পারিল না। ইহাই উপযুক্ত অবসর বিবেচনা করিয়া হুড়মুড় করিয়া সে মেয়ে গুলার গায়ের উপর গিয়া পড়িল এবং 'ভাগ্ যাও! জল নেহি দেগা'- বলিতে বলিতে কাহারও টব উল্টাইয়া ফেলিয়া, কাহারও ঘটি-বালতিতে লাথি মারিয়া হট্টগোল বাঁধাইয়া দিল (শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, ১৪২৩, পৃ. ১২)।

উচ্চবিত্ত কর্তৃক নিম্নবিত্তের শোষণের চিত্র ফুটে উঠেছে 'দুখিয়া' গল্পে। দুখিয়া শহরের নামকরা চোর। কোথাও কিছু চুরি হলে তার দায় এসে পেড়ে দুখিয়ার ঘাড়ে। এ যেন আমাদের রবীন্দ্রনাথের 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতাকে মনে করিয়ে দেয়। 'ভূতের মতন চেহারা যেমন নির্বোধ অতি ঘোর–/ যা-কিছু হারায়, গিন্নি বলেন, "কেষ্ট বেটাই চোর (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯০৮, পৃ. ১৩৭)।" কবিতায় গিন্নির যা-ই হারাত, সব দোষ চাপাতেন পুরানো ভৃত্য কেষ্টার ওপর। শৈলজানন্দের গল্পে সেই দৃশ্য আরও বীভৎস্য রূপে বিধৃত হয়েছে। শেকার সাহেবের ঘড়ি খুঁজে না পাওয়ায় তার দায় দুখিয়ার উপর এসে পড়ে। কিন্তু দুখিয়া শেকারের ঘড়ি নেয়নি। তারপরও শেকার তাকে চোর অপবাদ দিয়ে নির্মমভাবে প্রহার করে। নির্মম সেই নির্যাতনের ছবি লেখকের রঙ-তুলিতে অঙ্কিত হয়েছে এভাবে: 'তবে রে! সাহেব প্রাণপণে দুখিয়ার মাথার ওপর বসিয়ে দিলে এক লাঠি। দুখিয়া ... বসে পড়ল রাস্তার ধারে। সাহেবের লাঠি তখন সমানে চলছে। মাথায়, গায়ে, পিঠে, পায়ে দুমদাম বাড়ি (শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, ১৪২৪, পৃ. ১১৫)।'

শহরের উচ্চবিত্ত কর্তৃক নিম্নবিত্ত মানুষের উপর শোষণের চিত্র পাওয়া যায় 'কাঞ্চনমূল্য' গল্পে। গল্পের প্রধান চরিত্র নিস্তারিণী। জন্মসূত্রে দরিদ্র না হলেও স্বামীর অকালমৃত্যুতে অন্যের বাড়িতে রাঁধুনির কাজ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু গৃহকর্তার তার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ পেলে নিস্তারিণীর চাকরি চলে যায়। সে আর এক বাড়িতে কাজ নেয়। সেখানে বাড়ির বৃদ্ধ কর্তা নিস্তারিণীকে সন্তানের মতো স্নেহ করলেও বাড়ির পুত্রবধূ মাণিকমালার তা সহ্য হয় না। বৃদ্ধ নিস্তারিণীর পুত্র কার্তিককে সম্পত্তি দিয়ে দেবে বলে কার্তিককে চোর সাজিয়ে তার পেটে সজোরে লাথি মেরে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। নাগরিক উচ্চবিত্তের মানুষের অত্যাচারের চিত্র লেখক বর্ণনা করেছেন এভাবে:

> হারামজাদা! দূর হয়ে যা আমার বাড়ি থেকে! দূর হয়ে যা আমার সুমুখ থেকে! বলিয়াই তিনি সজোরে মারিলেন কার্তিকের পেটে এক লাথি। আচমকা লাথি খাইয়া যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া গিয়া কার্তিক গড়াইয়া পড়িল। ... দেখিল মুখ দিয়া কান দিয়া তাহার রক্ত পড়িতেছে (শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, ১৪২১, পৃ. ২৫৭)।

নাগরিক নিম্নবিত্ত নারীর উপর নির্যাতনের চিত্র নির্মোহ দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে 'মর্যাদা' গল্পে। গল্পে মোহিনীর স্বামীর মৃত্যুর পর মোহিনী ফিরে আসে কলকাতায় দাদার সংসারে। অর্থাভাবে জর্জরিত পাঁচুর বোন মোহিনীকে দেখে বৌদি তিরস্কার করে। ফলে শ্বশুরকুল ও পিতৃকুল উভয়কুলই মোহিনীকে ভাসিয়েছে অকূলে। তখন বেঁচে থাকার তাগিদে নিরুপায় মোহিনী পাড়ার এক বাড়িতে দশ টাকার বেতনে ঝি-এর কাজ নেয়। কিন্তু সেখানেও শুরু হয় এক যন্ত্রণার ইতিহাস। বাড়ির অন্য এক চাকর দাসু নানা রকম কু-প্রস্তাব তার কাছে পাঠায়। যেগুলো ব্যক্তিত্বের পক্ষে অবমাননাকর। স্বজন ও সমাজ যখন নারীকে ঠেলে দেয় অজান্তিক এক সর্বনাশের দিকে, তখন কীভাবে একজন নারী বেঁচে থাকে, তারই নির্মম-নিরাসক্ত বর্ণনা:

> মা বাবা মারা গেছে অতি শৈশবে, তারপর থেকে দাদার সংসারে কেটেছে অনাবশ্যক একটা গলগ্রহের মতো। তার যেন কোনও অধিকার নেই। কোনও প্রয়োজন নেই। তাকে শুধু প্রয়োজন– তার এই যৌবনোদ্ভিন্ন দেহটাকে কামাতুর লম্পট দাশুদের ক্ষুধার আগুনে আহুতি দেবার জন্য (শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, ১৪২৪, পৃ. ২৩১)।

শৈলজানন্দ নাগরিক নিম্নবিত্ত মানুষের উপর অত্যাচারের ছবি শৈল্পিকভাবে তুলে ধরলেও প্রতিবাদের ছবি একেবারে উপেক্ষিত নয়। নাগরিক নিম্নবিত্তের মানুষের মধ্যে কখনও কখনও তাদের প্রতিবাদের আগুন জ্বলে উঠতে দেখা যায় । 'ধ্বংসপথের যাত্রী এরা' গল্পে বস্তির মেয়ে অতসীকে অপমানের প্রতিশোধ স্বরূপ বস্তির লোকেরা অজিতকে মেরেছে। যদিও অজিত কোনো অপরাধ করেনি, তবু উচ্চবিত্তের সঙ্গে থাকায় তার উপর দায় এসে পড়ে:

> 'পাকড়ো উসকো।' কেহ বলিল,'চোট্টা হ্যায়' কেহ বলিল,'ডাকু হ্যায়।' সঙ্গে সঙ্গে মার্ মার্ করিয়া সকলে লাফাইয়া উঠিল। সারা বস্তির মধ্যে একটা গোলমাল হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। মেয়েরা কেহ লাঠি, কেহ কেরোসিনের লম্ফ হাতে লইয়া উঠানে আসিয়া জড়ো হইল (শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, ১৪২৩, পৃ. ১৫)।

শৈলজানন্দ নারীর বিদ্রোহী রূপ অঙ্কন করেছেন 'মর্যাদা' গল্পে। গল্পে দেখা গেছে অল্প বয়সে বিধবা হয় মোহিনী। শ্বশুরকুলে ঠাই মেলেনি বলে কলকাতায় দাদার সংসারে আসে। কিন্তু বৌদির কারণে সেখানেও মেলে না আশ্রয়। তাই সে ঝিয়ের কাজ নেয় পাড়ার একটা বাড়িতে। বাড়ির আর এ চাকর দাসুর কুদৃষ্টি পড়ে মোহিনীর ভরা যৌবনোদ্ভিন্ন দেহের উপর। দাসু তার উদ্দেশ্য সফল করতে মোহিনীকে নানা প্রলোভন দেখায়। কিন্তু নাগরিক নিম্নবিত্তের নারীর কাছে অর্থের চেয়ে নিজের সম্ভ্রম রক্ষাই বড়। নিজের অস্তিত্ব রক্ষার্থে মোহিনী প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে:

> চিৎকার করে উঠল, বেরো মুখপোড়া। ফের যদি ওসব কথা বলিস তো কিছু বাকি রাখব না বলে দিচ্ছি। খ্যাংরা মারব, মুখে তোর নুড়ো জ্বেলে দেব। এমনি সব নানা বাক্য বলতে বলতে ডান দিকে গলি রাস্তায় ঢুকে পড়ল মোহিনী। সেইখানেই তাদের বাড়ি। দাসু আর সাহস পেলো না তার পিছু ধরতে (শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, ১৪২৪, পৃ. ২২৮)।

ছয়.

বিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকেই সমস্ত পৃথিবীতে নেমে আসে ভাঙা-গড়া ও পরিবর্তনের এক আবহ। অর্থনীতি-সমাজনীতি-রাষ্ট্রনীতি সর্বত্র বৈপ্লবিক চিন্তাধারার প্রভাবে মানুষের মূল্যবোধ সম্পর্কে পূর্বতন ধারণা ও প্রত্যয় প্রচণ্ড ধাক্কা খায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এই পরিস্থিতিকে করে তোলে আরও জটিল ও আসন্ন বিপর্যয়সম্ভব। ফলে চরম অনিশ্চয়তার অন্ধকারে– অসহায় মানুষ ক্রমশ আশ্রয় নিতে থাকে অবক্ষয়িত আপন চিত্ত-বিবরে। নাগরিক নিম্নবিত্তের সমাজে এই অবক্ষয় ঘটে বেশি। এই অবক্ষয়িত জীবনের বাস্তবচিত্র রূপায়ণে শৈলজানন্দ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। নাগরিক নিম্নবিত্ত মানুষের অবক্ষয়ের চিত্র ফুটে উঠেছে 'জীবনযন্ত্রণা' গল্পে। দারিদ্র্যপীড়িত যাদবের অর্থের লোভ ছিল প্রচুর। সব সময় তার মনিবের অর্থ ভোগ করার কৌশল করে। তার মনিব রোগাক্রান্ত। হাঁপানির টান আছে। যখন হাঁপের টান ওঠে, তখন তাকে ঔষধ সেবন করাতে হয়। আর ঔষধ সেবনের দায়িত্ব ছিল যাদবের উপর। পয়সার লোভে একদিন যাদব তার মনিব অসুস্থ হলে তাকে ঔষধ দেয় না। ফলে ভদ্রলোক ঔষধের অভাবে রোগযন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে মারা যান। যাদব অর্থের জন্য তার নীতি-নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে তার মনিবকে হত্যা করল। গল্পে নৈতিক অবক্ষয়ের চিত্র লেখক বর্ণনা করেছেন এভাবে:

> টাকার লোভে আমিই ওঁকে খুন করেছি বাবু। কোথায় ওঁর টাকা ছিল আমি বুঝতে পেরেছিলাম। ভেবেছিলাম সেই টাকাগুলো নিয়ে আমি পালিয়ে যাব। রাত্রে হাঁপের টান উঠল। বুকে যন্ত্রণা উঠলেই যে ঔষধটা খাইয়ে দিতাম তাঁকে, সেটা বরাবর চাইলেন। কিন্তু আমি দিলাম না (শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, ১৪২৪, পৃ. ২৫)।

যে অর্থের জন্য যাদব তার মনিবকে বিনা ঔষধে হত্যা করল, সেই মনিব মৃত্যুর পূর্বে তার সকল সম্পত্তি চাকর যাদবের নামে উইল করে দেয়। সকল সম্পত্তি যাদবকে দিয়ে গেছে, এ কথা জানতে পেরে যাদব দুঃখে-অনুতাপে

যন্ত্রণা পেতে থাকে। মূলত জীবনের শাশ্বত মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ফলে মানুষের মনে যে জীবনযন্ত্রণা সৃষ্টি হয়, শৈলজানন্দ তাঁর স্বরূপ উন্মোচন করেছেন এভাবে:

> কিন্তু আমার যন্ত্রণার শেষ হচ্ছে না বাবু। আমি কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না। যাঁকে আমি এই রকম করে মারলাম তিনিই তাঁর যথাসর্বস্ব আমাকেই দিয়ে গেলেন। আমি কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না বাবু! আমাকে আপনি বাঁচান, আমাকে বাঁচান (শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, ১৪২৪, পৃ. ২৫)।

শৈলজানন্দ নাগরিক নিম্নবিত্ত মানুষকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। তাছাড়া তিনি দীর্ঘদিন কলকাতার বস্তিতে কালাতিপাত করেছেন। ফলে তীর্যক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে নিম্নবিত্ত মানুষের মূল্যবোধের অবক্ষয়ের চিত্র উপস্থাপন করেছেন। 'মূর্খ যতিলাল' গল্পে দেখা যায়, যতিলাল নিম্নশ্রেণির অসহায় দরিদ্র গয়ারামকে তার বাড়িতে গৃহ কাজে নিযুক্ত করে তার জীবিকার ব্যবস্থা করে দেয়। অথচ গয়ারামের মধ্যে কৃতজ্ঞতাবোধের লেশটুকু নেই। সে যতিলালের কাছে দুই শত টাকা ধার করে এবং এক রাতে যতিলালের বাক্স ভেঙে টাকা-পয়সা, জামাকাপড় নিয়ে পালিয়ে যায়। লেখকের ভাষায়:

> এখান থেকে আর যাবে না বলে তাকে আমি দুশ টাকা ধার দিয়েছিলাম। ওর ছেলের বিয়ের জন্যে। তার ওপর এই দেখুন–' বলে সে তার বাক্সটা তুলে এনে দেখালে– তালা ভাঙা, ভেতরে টাকা কড়ি, জামাকাপড় যা কিছু ছিল – নিয়ে চলে গেছে (শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, ১৪২৪, পৃ. ৯)।

এভাবে নাগরিক নিম্নবিত্তের জীবনাদর্শ বিপন্ন হয়ে যায়, ধসে যায় মানবিক মূল্যবোধের ভিত্তিভূমি। শৈলজানন্দ স্বভাবসিদ্ধ নিরাসক্ত নিরুচ্ছ্বাস বর্ণনাভঙ্গিতে অথচ আশ্চর্য শক্তিমত্তায় তার বাস্তব রূপটি গল্পে তুলে ধরেছেন।

সাত.

শৈলজানন্দ তাঁর গল্পে নাগরিক নিম্নবিত্ত নারীর মাতৃপ্রাণের অপত্য স্নেহার্তির অভিনব প্রকাশ ঘটেছে। এরূপ একটি গল্প 'প্রতিনিধি'। গল্পে বর্ধমান শহরের নিম্নশ্রেণির কাঠ ব্যবসায়ী হারাধন ও তার স্ত্রীর কোনো সন্তান নেই। তাই রণজিতের একমাত্র মেয়ে বুলাকে কাছে পেয়ে সন্তানের স্বাদ পায়। বুলার মা মারা যাওয়ার আগে কামিনীর হাতে বুলাকে দিয়ে গেলে তার মাতৃত্ববোধ আরও বেশি প্রকাশ পায়:

> বুলাকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া কামিনী জিজ্ঞাসা করিল, 'আমার কাছে থাকতে পারবি তো।' 'হুঁ বলিয়া ঘাড় নাড়িয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়া ঠোঁটের ফাঁকে মৃদু একটুখানি হাসিল মাত্র।' কামিনীর অতৃপ্ত মাতৃহৃদয় তখন কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে (শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, ১৪২৪, পৃ. ২৭৩)।

পিতৃস্নেহের প্রকাশও ঘটেছে এই গল্পে। গল্পে বিত্তবৈভবের কাছে পিতৃস্নেহই বড় হয়ে উঠেছে রণজিতের মধ্যে। রণজিতের স্ত্রী মারা যাওয়ার আগে বুলাকে কামিনীর হাতে তুলে দিয়েছিল। কিন্তু মালা মারা যাওয়ার পর রণজিত

তার একমাত্র কন্যা বুলাকে কামিনীর কাছে রাখতে চায় না। বুলাকে নিয়ে অন্যত্র চলে যেতে চায়। লেখক বলেন, 'সিঁড়ি পার হইয়া ওদিকের বারান্দায় আসিয়া রণজিত বলিল, শুধু দেখা করে নয়, বুলাকে আমি নিয়েই যাব (শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, ১৪২৪, পৃ. ২৭৬)।' মূলত অর্থ ও বিষয়-সম্পত্তির চেয়ে নিম্নবিত্তের মানুষের কাছে পিতৃত্বের দাম অনেক বেশি। টাকা-পয়সা বা বৈষয়িক বন্ধনে নয়, নিম্নবিত্তের এই মানুষগুলো আত্মার বন্ধনেই জীবন কাটাতে চায়।

নাগরিক নিম্নবিত্ত মানুষ সর্বদা টিকে থাকার লড়াই করে। আর্থিক সংকট তাদের জীবনের নিত্যসঙ্গী। দারিদ্র্যের কশাঘাতে নাগরিক নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন জর্জরিত। তবু এসব মানুষের মধ্যে অপত্যস্নেহ, ভালোবাসার কোনো ঘাটতি নেই। শৈলজানন্দ তাঁর সাহিত্যে, বিশেষ করে তাঁর গল্পে সন্তানবাৎসল্য বা সন্তানের প্রতি মমত্ববোধ ও দায়িত্ববোধ আমাদেরকে বিমোহিত করে। এর একমাত্র কারণ, শৈলজানন্দের নিম্নবিত্ত মানুষকে নিয়ে লেখা গল্পে যে সন্তানবাৎসল্য দেখা যায়, সে সন্তানগুলোর অধিকাংশই আপন সন্তান নয়, অন্যের সন্তান। তবু সন্তানের প্রতি ভালোবাসার কমতি নেই। তাছাড়া শৈলজানন্দ নিজেই অন্যের কন্যাসন্তানকে নিজের সন্তানের মতো লালন-পালন করেছেন। এরূপ একটি গল্প 'বোকা নরহরি'। গল্পে নরহরি ভাগ্যকে বিশ্বাস করে। তাই সে প্রতিদিন খবরের কাগজের রাশিফল, লগ্নফল দেখে। লেখকের বাড়িতে কাগজ পড়ার জন্য নরহরি গেলে সে জানায় তার ছটা মেয়ে। কিছুতেই সংসার চালাতে পারে না। প্রচণ্ড অভাবের মধ্যেও সে চেষ্টা করে সন্তানগুলোর মুখে খাবার তুলে দিতে। অথচ এই সন্তানগুলো তার নিজের নয়, দূর সম্পর্কের এক ভাইয়ের। লেখকের বর্ণনা:

> ওর কোন্ এক দূর সম্পর্কের ভাই ভবানীপুরে না কোথায় যেন থাকত। তার স্ত্রী মরে গেল আগে। তারপর সে নিজেও মরে গেল। তা মরল তো মরল- তোর কি? তারই ছ'টা মেয়ের বোঝা নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়ে ব্যাটা নিজের সুখ-সুবিধে সব কিছু জলাঞ্জলি দিয়ে এখন ঠ্যালা সামলাচ্ছে (শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, ১৪২৩, পৃ. ৩৪১)।

শহুরে এই হতদরিদ্র নরহরির এই মহৎ অন্তঃকরণ, স্নেহ-মায়া-মমতা আমাদের পাঠককে বিমোহিত করে।

বাংলা সাহিত্যে পশুপ্রীতির গল্প অনেক পড়েছি। শরৎচন্দ্রের (১৮৭৬-১৯৩৮) 'মহেশ', প্রভাতকুমারের (১৮৭৩-১৯৩২) 'আদরিণী', তারাশঙ্করের (১৯৯৮-১৯৭২) 'কালাপাহাড়', পরশুরামের (১৯৮০-১৯৬০) 'লম্বকর্ণ', বনফুলের 'গণেশ জননী' এ ধারায় দীপ্তমান উদাহরণ। কিন্তু শৈলজানন্দ এই শ্রেণির গল্পকে স্বতন্ত্র মহিমায় গ্রথিত করলেন। শৈলজানন্দ নাগরিক নিম্নবিত্তকেন্দ্রিক অনেক গল্পে নারীর সন্তানহীনতার জ্বালা, সন্তানহীনা নারীর গঞ্জনা, দুঃখের চিত্র তুলে ধরেছেন। এই সব সন্তানহীনা নারীর মধ্যে কখনও স্বাভাবিক আবার কখনও অস্বাভাবিকভাবে বাৎসল্যের আবির্ভাব ঘটে। সন্তানহীনা নারীরা পশুপাখিকে সন্তানস্নেহে ভালোবাসে। তাছাড়া, শৈলজানন্দও পশুপাখি ভালোবাসতেন। ঘরে কুকুর, বেড়াল পুষতেন। সন্তানের মতোই লালিত হতো এ সকল প্রাণীগুলো। তারই প্রভাব পড়েছে 'পোড়ারমুখী' ও 'আঁচড়' গল্পে। দুটি গল্পেই সন্তানহীনা দুজন নারীর পশুর প্রতি ভালোবাসার

অনুপম চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। দুটি গল্পের মধ্যেই দেখা যায় সন্তানহীন পরিবার দুটিতে বিড়ালের আগমনে স্ত্রীরা প্রথমে বিরক্তবোধ করলেও পরে তাদের মধ্যে সন্তানবাৎসল্যের আধিক্য দেখা যায়। তারা প্রাণীগুলোকে সন্তানের মতো ভালোবাসে। শৈলজানন্দের 'পোড়ারমুখী' গল্পের পোড়ারমুখী নামের বিড়ালটিকে প্রথমে দূর দূর করলেও শেষে সন্তানস্নেহে তার জন্য চোখ দিয়ে দরদর করে জল গড়িয়ে আসে যেমন:

> বিড়ালের বাচ্চাটাকে দুহাত দিয়ে তুলিয়া ধরিয়া পোড়ারমুখীর কোলের কাছে নামাইয়া দিয়া বলিল, কাল নিজেও যত কেঁদেছিস আমাকেও তত কাঁদিয়েছিস, এই নে মা তোর খোকন নে (শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, ১৪২১, পৃ. ২৩৫)।

আট.

নাগরিক নিম্নবিত্ত মানুষের উদার ও মানবিকতার অনুপম চিত্র মেলে শৈলজানন্দের 'পাঁচু মিস্ত্রি' গল্পে। পাঁচু চক্রবেড়িয়ার ফুলবাসিয়া বস্তিতে থাকে। ট্যাক্সি চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। মূলত বস্তিতে যারা বসবাস করে, তারা সকলেই হতদরিদ্র, অর্থকষ্ট তাদের নিত্যসঙ্গী। পাঁচুর ক্ষেত্রেও তাই। একদিন তার ট্যাক্সিতে গয়নাভর্তি একটা বাক্স কেউ ফেলে যায়। ইচ্ছা করলে পাঁচু গয়নাগুলো নিতে পারত। কিন্তু সে তা করেনি। পাঁচু সেগুলো ফেরত দেয়ার জন্য বিজ্ঞাপন দেয়ার ব্যবস্থা করে। আবার গল্পের কথক পাঁচুকে গয়নাগুলো নিতে বললে তা নেয়নি। চুমকিকে গয়নাগুলো দিতে বললেও দেয়নি। দরিদ্র হলেও তার মধ্যে আত্মসম্মানবোধ লক্ষণীয় :

> পাঁচুকে পরীক্ষা করবার জন্য বললাম, 'তাই করো আপনি এই কথা বলছেন দাদাঠাকুর? কখখনো না। চুমকি ভাববে আমি চোর।' 'চুমকি জানবে কেমন করে?' 'আমার মন তো জানবে। সে মন দিয়ে আমি চুমকির কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারব না (শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, ১৪২৪, পৃ. ৯)।

নিম্নবিত্ত মানুষের মহত্বপূর্ণ প্রাণসত্তার প্রকাশে শৈলজানন্দ দক্ষ কারিগর। নাগরিক নিম্নবিত্ত মানুষের মধ্যে মানবতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে 'মিছে কথা' গল্পে। শহরে কথকের বাসায় চাকরের কাজ করে। কাজ করে যা উপার্জন করে তা সুরেনের মাকে পাঠায়। সুরেন যোগীনের বন্ধু। দুজনেই শহরে আসে কাজের জন্য। কিন্তু অতিরিক্ত মদ্যপানের জন্য সুরেন মারা যায়। এ কথা যোগীন সুরেনের মাকে জানায়নি বরং সে বলে সুরেন মদ চেড়ে দিয়েছে, সে কাজ করছে। আপাতদৃষ্টিতে এই মিথ্যা বলা অন্যায় হলেও মায়ের মন শান্ত হয়েছে। সুরেনের মৃত্যুর খবর না দিয়ে নিজেই সুরেন সেজে প্রতি মাসে যা অর্থ উপার্জন করে, তা সুরেনের মাকে পাঠিয়ে দেয়। যোগীন তাই কথককে বলে:

> মাইনের পঁচিশ টাকা আপনি যখনই দিয়েছেন, আমি পাঠিয়ে দিয়েছি সুরেনের মাকে। সুরেনকে বাঁচিয়ে রেখেছি তার কাছে। ... বুড়ি কত দিনই বা বাঁচবে! জানুক না তার ছেলে মদ! ছেড়েছে। বেঁচে আছে, ভালো আছে; ব্যবসা করছে (শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, ১৪২৪, পৃ. ১৮৪)।

সুরেনের মা যাতে পুত্রশোক না পায়, তাই যোগীন মিথ্যা কথা বলেছে। যোগীনের মহত্ত্বপূর্ণ প্রাণের রূপ দেখে লেখক অবাকও হয়েছেন। তাই গল্পটি শৈলজানন্দের একটি উল্লেখযোগ্য গল্পের শিরোপা পেতে পারে।

নয়.

নাগরিক নিম্নবিত্তের জীবনের বাস্তব ছবি অঙ্কনে শৈলজানন্দ ছিলেন সিদ্ধহস্ত। শৈলজানন্দের গল্পসম্ভারে নাগরিক নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনের প্রায় সকল দিক উন্মোচিত হয়েছে। তাদের জীবনাচার, পেশা, নীতিনৈতিকতা, প্রেম-ভালোবাসা, মানবতা প্রভৃতির নিপুণ পরিচয় পাওয়া যায় এই গল্পসম্ভারে। 'নোংরা বস্তি', 'ধ্বংসপথের যাত্রী এরা' গল্প তার বাস্তব উদাহরণ। নাগরিক নিম্নবিত্ত মানুষের প্রাত্যহিক জীবন-যন্ত্রণা, সুখ-দুঃখ, বাদ-প্রতিবাদকে শৈলজানন্দ চিত্রিত করেছেন বস্তু-অভিজ্ঞতা ও ভাবের সমগ্রতায়। এ রকম নগরকেন্দ্রিক অনেক গল্পে কলকাতার বস্তি, বস্তির মানুষের জীবন, শহুরে নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন ও তার বহুমাত্রিক রূপ জীবন্ত হয়ে উঠেছে। নাগরিক নিম্নবিত্ত জীবনের এই আলেখ্য লেখকের জীবনাভিজ্ঞতা, শৈল্পিক বোধ এবং অন্তর্দৃষ্টির গভীরতারই পরিচায়ক। সামগ্রিক বিচারে বলা যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে নিম্নবিত্ত মানুষের বহুমাত্রিক জীবনের শিল্পসত্তান্বেষণ বাংলা সাহিত্যে প্রসঙ্গ ও প্রকরণে বিশেষ স্থান দখল করে আছে।

তথ্যসূত্র

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। (১৪২১)। *কল্লোল যুগ*। কলকাতা: এনসি সরকার এন্ড সন্স প্রাঃ লিঃ।

অচ্যুৎ গোস্বামী। (২০১৩)। *বাংলা উপন্যাসের ধারা*। ঢাকা: বিভাস।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। (২০১৫)। *কালের পুত্তলিকা*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

গোপিকানাথ রায় চৌধুরী। (২০১৪)। *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.)। (২০১৫)। *নিম্নবর্গের ইতিহাস*। কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স।

জগদীশ গুপ্ত। (১৩৬৫)। *জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী* (২য় খণ্ড)। নিরঞ্জন চক্রবর্তী (সম্পা.)। কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিঃ।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। (১৪১৯)। *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প*। জগদীশ ভট্টাচার্য (সম্পা.)। কলকাতা: প্রকাশ ভবন।

নির্মল দাশ। (১৯৯৭)। *চর্যাগীতি পরিক্রমা*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

প্রেমেন্দ্র মিত্র। (২০০১)। *'শৈলজানন্দ' শৈলজানন্দ মুখোপধ্যায় বিশেষ সংখ্যা*। বুদ্ধদেব দাশ (সম্পা.)। কলকাতা: পশ্চিম বাংলা আকাদেমি।

বাঁধন সেনগুপ্ত। (২০১৫)। *শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়*। কলকাতা: সাহিত্য অকাদেমি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। (২০০৮)। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প*। যুগান্তর চক্রবর্তী (সম্পা.)। কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

মাম্পি বৈদ্য। (২০১৮)। *তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত উপন্যাস : আখ্যানতত্ত্ব ও নিম্নবর্গীয় চেতনার আলোকে*। কলকাতা: একুশ শতক।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। (২০০৫)। *চণ্ডীমঙ্গল*। রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.)। কলকাতা: চ্যাটার্জি পাবলিশার্স

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। (১৩৮৮)। *সাহিত্যের পথে*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। (১৯০৮)। *কথা ও কাহিনী*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। (১৪২১)। *শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় গল্পসমগ্র*। বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.)। কলকাতা: মিত্র এন্ড ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। (১৪২৩)। *শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় গল্পসমগ্র* (২য় খণ্ড)। বুদ্ধদেব দাশ (সম্পা.)। কলকাতা: মিত্র এন্ড ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। (১৪২৪)। *শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় গল্পসমগ্র* (৩য় খণ্ড)। বুদ্ধদেব দাশ (সম্পা.)। কলকাতা: মিত্র এন্ড ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ।

সঞ্জীব দাস। (২০১১)। *বাস্তববাদের বহুরূপ ও শৈলজানন্দের কথাসাহিত্য*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।

প্রেমেন্দ্র মিত্র। (১৯৫২)। *প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প*। সৌরীণ ভট্টাচার্য (সম্পা.)। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।